ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম

সূচীপত্র

চিনি না ৯
আমি মরে গেলে ১০
অপ্রমাণ ১১
সুখ ১২
যোগ্যতার জন্য ১৩
রায় ১৪
সঙ্গী ১৫
হে প্রেমিক ১৬
ভৈরবী ১৭
যন্ত্রণাহীন জীবনযাপন ১৮
বয়স্ক আঠারো ১৯
কলকাতার করকমলে ২০
পাঁচ মে, নিজেকে ২১
কাক ২২
এভাবে অন্ধতা ২৩
রাজপথে আসুক সে ২৪
মিগ্রেইন ২৫
কবিতা কীভাবে হয় ২৬
নিজেকে অর্পণ করে রাখা ভালো ২৭
আরও কিছুদিন দাও ২৮
চতুর্মুদ্রা ২৯
অবরোধ ৩০
স্বদেশ শরীর ৩১
ফাল্গুনে নির্বন্ধ ছিল ৩২
যে জায়গাটা হল ফাঁকা ৩৩
পুরুষ ৩৪
ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম ৩৫
দড়ি ধরে' ওঠো ৩৬
চিত্তশুদ্ধির দিকে ৩৭

পশ্চিমে ফেরায়	৩৮
ফেরীঘাট	৩৯
এক-বিপরীত	৪০
তবু কেউ কেউ জানে	৪১
ভুল জায়গায়	৪২
অপ্রাসঙ্গিক	৪৩
রাজপথ	৪৪
বেড়াতে বেড়াতে মাঠে	৪৫
নীলবাড়ি	৪৬
বৃদ্ধ পাম	৪৭
অনিয়মিত	৪৮
প্রস্থান	৪৯
কথা	৫০
দুঃখ ছুঁয়ে আসে	৫১
কে ডেকেছে পথে	৫২
কেন	৫৩
ছোটবড়	৫৪
দ্বৈধ	৫৫
আসলে ভোরবেলা	৫৬
হঠাৎ একদিন	৫৭
বেরালছানা	৫৮
কলম	৫৯
প্রতিমার মতো মুখ	৬০
কয়েকটি ছোট কবিতা	৬১
তোমার ভ্রূক্ষেপহীন	৬৪

ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম

চিনি না

আমি তোমাকে চিনি না
তুমি যে-ই হও আমার বিশ্বাসে এসো।
আমার যে-চোখ বেশি দেখে
তাকে তুমি বন্ধ করো, অন্ধ করো, অন্তর্মুখে
নিশ্চল করো হৃদয়।
আমি প্রভাবিত হবো যদি তাপত্রাণ হও
আপন্নকে দাও শীতলতা।

আমি তোমাকে চিনি না
যদি বন্ধ করো চোখ, ফোটাও সংবিৎ
যদি নিতে পারো আমার ধ্যান আর
হৃৎপিণ্ডের মধ্যাস্থিত জল
তাহলে তুমিই আমার একমাত্র
সেই একমাত্র।

আমি মরে গেলে

আমি মরে গেলে চলে যাবে ভালোবাসা।
পৃথিবী স্বাধীন হবে যেমন স্বাধীন
বিধবা পতিতা কিংবা নারীচ্যুত গোঁয়ার পুরুষ।
যেমন মাতৃত্ব নিয়ে মাতামাতি হয়েছে অঢেল
যেমন সঙ্গম আজ হয়ে গেছে কেবলই সন্ত্রাস
ঠিক তেমনি ঢলাঢলি ভালোবাসা নিয়ে—
সংসারে ছড়ায় নোংরা হাওয়া।
ভালোবাসা ভালোবাসা চতুষ্পদে হাঁটে
শহরের ঘরে পথে গ্রামে গঞ্জে মাঠে
হাঁটে, বসে, ব'সে যায়, জমে।
পৃথিবী ভীষণ ক্লান্ত, আমি তার চোখ
বহুদিন ধরে দেখে গেছি
আমি মরে যাব ভালোবাসা সঙ্গে যাবে
আর বর দিয়ে যাব—ভুবন ঈশ্বরী,
এইবার মুক্তগ্রহ হও।

অপ্রমাণ

কীভাবে প্রমাণ হবে, ভালোবাসি?
মুখে হাসি, অনুভাব ভ্রূভঙ্গ প্রলাপে?

অথচ বাহিরে এই তীক্ষ্ণ সূর্যতাপে
ত্বক পোড়ে, শুকোয় নবনী
ভ্রূধনু অভঙ্গ, স্থির।
কীভাবে প্রমাণ তবে
অক্ষরে, কথার সাজে?

কোথাও প্রমাণ নেই ভালোবাসি।
তবু ভালোবাসি
অসহিষ্ণু অন্ধ মূক এবং বধির
নির্বোধ প্রাণীর মতো, প্রতিশ্রুতিহীন।

ভালোবেসে বাঁচি, মরে যাই
বাঁচি, ভালোবাসি
প্রমাণ অদৃশ্য থাকে, হাওয়া যে কঠিন।

সুখ

পোশাকি সুখেরা সব জীর্ণ হয়ে এল কালক্রমে।
সেসব সতেজ সুতো
অহংকারী রঙের আধার
সম্মত আঙুলে ওই ঋদ্ধিমান নক্ষত্র শরীর
আহা দেখ পরাস্ত, শয়ান।

পোশাকের সুখ, নাকি সুখের পোশাক বলব?
                                        না কি দৃষ্টিভ্রমে
অন্য কোনো ত্রিরায়তনিক নাম
শরীর লুকিয়ে ফেলে ঢুকে গেছে জীর্ণ এ পোশাকে?
যা-ই বলো নাম তবু প্রগাঢ় সুতোর পাট এখন শিথিল
তাই, স্মৃতির তোরঙ্গে এর নির্বাসন। আনো
নতুন সুতোর সংজ্ঞা, ফিটফাট সুখ, খোলা রঙ
                                        এখন যা সয়।
রকমারি সুখ, ভারি সুখ,
সুখ তীব্র, হালকা বা নিটোল—
শোনো না, সূর্যাস্ত হলে অন্তরীক্ষে ফেরিঅলা হাঁকে!

যোগ্যতার জন্য

সমস্ত বাহুল্য খুলে রাখলাম।
তুলে নিলাম ঘোমটা, সোনার টায়রা, সিঁথিমৌর।
এই নাও সোনালি রিবন, রেশমি ঝালর, মুক্তোর কাঁটা।
আর এই রাখলাম তোমার পায়ের একপাশে আমার ভুল,
অন্যপাশে অহংকার।

এবার আমি নিরাভরণ।
আমার মাথায় রাখো তোমার পাঁচ আঙুলের ছাপ
সিঁথিতে সমান্তরাল করো তোমার অক্ষয় তর্জনী।
মা, এবার আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে বলো—
'এই পৃথিবীর যোগ্য হও।'
তারপর চলে যাব আমি নির্বাসনে
অপেক্ষা করব নতশির
যতদিন না এই মহীয়ান জন্মের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

রায়

আকাশের কান্না পৃথিবীর মাটিতে পড়লে
ফেটে বেরোয় জীবন—
যার অন্য নাম উদ্ভিদ।
পায়ে সে আঁকড়ে থাকে মাটি
হাত বাড়ায় আকাশে,

জনতা তাকিয়ে বলে—'সৃষ্টি!'

মানুষের রক্তপাত হয় মগজে
কাগজের ওপর ফোটে তার দলিল
তারও নাম হতে পারতো উদ্ভিদ—
পায়ে যে আঁকড়ে থাকে অভিজ্ঞতা
হাত বাড়ায় শিল্পে—

জনতা তাকিয়ে বলে—'অনাসৃষ্টি!'

সঙ্গী

আমরা যার সঙ্গে নিত্য বসবাস করি
তার নাম প্রেম নয়, উদ্বেগ।
প্রেম অতিথির মতো
কখনও ঢুকে পড়ে অল্প হেসে,
সমস্ত বাড়িতে স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে
হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর সারাক্ষণ
আমরা কেউ আর উদ্বেগ
আমরা একজন আর উদ্বেগ
বসবাস করি
রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত।

হে প্রেমিক

কিছু কি দেবার আছে বাকি, হে প্রেমিক!
এবার কী চাহ বলো, শরীরাতিরেকী
অন্য কোন প্রাকৃত বৈভব।
দেব কি সূর্যাস্ত ওই
গৃহশীর্ষে পাখি কিংবা উড়ন্ত বেলুন
বাতাসের হাহাশব্দ, মৃত্তিকার ভাপ
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ হেমন্তে মাটির ঘরে ম্লান
কিংবা নীল সমুদ্রের নুন।
দিতে পারি বীজ, তুমি কর যদি কিছু স্নেহাধান
অক্লেশে ছড়াবে তারা অংকুর উৎসব
তোমার বসতি ঘিরে, চারিদিকে।
হে প্রেমিক, ছুঁয়ে কি দেখেছ ওই স্বচ্ছন্দবিকাশী
কান্তিমতী কুঞ্জলতাটিকে!

ভৈরবী

স্বভাবে ও নামে
একত্র রেখেছ এ কী তীব্র প্রতারণা
হে রাগিণী, হৃদয়হারিণী।

উচ্চারিত হলে
চোখে জ্বলে উদ্যত ত্রিশূল
এলোকেশী রক্তিমাভা করাল রমণী।

অথচ ভৈরবী
বৃত হলে কণ্ঠে ও সুস্বরে
তুমি সেই কোমলাঙ্গ প্রিয়বিরহিনী
ধৈবতে নিখাদে তোলে মুখ
রেখাবে গান্ধারে বোজো আঁখি
ভোরের চৈতন্যে কাঁপে সুখ দুঃখ সুখ
নিশ্চিত মধ্যমে ভাসে খেদ
ঝরে যায় বিশাল বিচ্ছেদ
প্রতিদানহীন ভালোবাসা।

সমস্ত শরীর ভরে রেখেছ ক্রন্দন ও পিপাসা
তবু করপুটে বাঁধা আমাদের অমোঘ যৌবন
লাবণ্যে এবং হাহাকারে।

নামে শুধু লেগে থাকে
ভয়—
ভুল পোশাকের মতো, অভীষ্ট শরীরে।

যন্ত্রণাহীন জীবনযাপন

সকাল সন্ধে অষ্টপ্রহর
ভিতরবাহির বাহিরভিতর
দুঃখসুখের দ্বন্দ্ব এমন—
হয় কি যথেষ্ট বিজ্ঞাপন?
আপনি কি সে সাবধানী লোক
জানেন নাকি সে মুষ্টিযোগ
আপৎকালে বজ্রসায়ক
এড়িয়ে চলার ধরনধারণ?
আমরা কিছু আকাট মূর্খ
আঁকড়ে আছি বালির দুর্গ
বুজেছি চোখ, দেখতে না হোক
চলছে লড়াই কী প্রাণপণ।
ইচ্ছে বুকে, দুঃখবিহীন
যন্ত্রণাহীন জীবনযাপন।

বয়স্ক আঠারো

ইচ্ছে ছিল একান্ত, হই বিশুদ্ধ নিষ্ঠুর
আপসহীন বুদ্ধিজীবী ভাষাতাত্ত্বিক ক্রুর
ধীমতী না শুধুই স্ত্রীলোক, শরীর না কি আলো
না, শোনে না আলাপচারি ভাবখানা জমকালো
কেউ বলে বা উচ্চনাসা তুচ্ছতা সামান্যে
গোলমালে দিন কাটল এবার পা দিই অপরাহ্ণে।

ব্যাঘাত ক্লান্তি অপরিচয়, হঠাৎ তুমি কে—কে
আন্দোলনের ধ্বজা ওড়াও অনেক ভেতর থেকে
উপলব্ধি অতল নাকি প্রজ্ঞা অতিগাঢ়
আহৃত জ্ঞান সর্বগ্রাসী বয়স্ক আঠারো
স্ফটিকসংবিতে রক্তজবার প্রতিফলন
শব্দ ভাঙে শব্দ ফোটে শব্দ ছলোছলো
অশ্রুমুখী, শব্দ সুখী প্রসিদ্ধ বা নতুন
মাত্রা বসাও পূর্বে পরে মধ্যখানে আগুন।

সাধ ছিল সাধ্য ছিল না—পুরোনো সান্ত্বনা
উত্তরাধিকার আমাকে নিশ্চিত দিয়ো না।
মনোহরণ ইচ্ছাপূরণ তীক্ষ্ম মেধা যাহার
পদ্মহাতে তার তুলে দিই আনন্দ উপহার
কৃতজ্ঞতা পশ্চিমাশা, ভুলবে সে সত্বর
সাফল্য যায় পূর্বমুখে, সাফল্য সুন্দর।

তোমাকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে হয়।
বর্ষার ঝাঁজালো পদ্মা কিংবা তীব্র আড়িয়ল খাঁ
দুষ্প্রাপ্য সোনার বর্ণ লক্ষ্মীদিঘা ধান
বিশাল বটের পৃষ্ঠে শুভ্র সূর্যোদয়
দুয়াল্লির মঠ, বিলে মাছের ভেসাল
লক্ষ লক্ষ ঘাসফুল, কালো কাক, নীলকণ্ঠ পাখি
আকাশ মাটির জোড়ে দিগন্তের সবুজ বলয়
সন্ধ্যার নৈঃশব্দ, রাতে পুঞ্জ অন্ধকার
কিংবা চৈত্রে কৌমারহরণ চাঁদ আর
ব্রাহ্ম মুহূর্তের শীতলতা।
কলকাতা,
তোমাকে আত্মীয় ভেবে
এসব সঞ্চয় থেকে কিছু কিছু উপহার
এ সময়ে দিতে ইচ্ছে হয়।

পাঁচ মে, নিজেকে

দেখ, এই শরীর থেকে তোমার জন্ম,
এই শরীর এখন নিষ্প্রাণ।
যুদ্ধ ছাড়া আত্মসমর্পণ হীনতা
দেখলে, দুর্ধর্ষ সংগ্রাম কার নাম।
দেখলে যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ,
শেষ শান্তির মিনতি।
ডান হাতে জপের মুদ্রা, হৃদয়াশ্রিত বাম হাত
আর এই অলৌকিক চোখ।
দেখ রাজকীয় শেষযাত্রা নীরব ও উদাসীন।
স্থির হও, এ শরীর অগ্নিস্পর্শ করলে
হাত ধরবেন তাঁর জননী—
যে নাম আমৃত্যু তাঁর কণ্ঠস্বরে. ওষ্ঠে,
আপাতজ্ঞানহীন চেতনায়।
দেখ, জ্বলে উঠল শিখা—
এইমাত্র যিনি নিঃশেষ হলেন
তিনি তোমার গৌরবান্বিত ঋণ,
তোমার পিতা।

কাক

হঠাৎ জমলো কিছু নীল মেঘ
বৃষ্টি এসে ভেজালো পাঁচিল
ভেজে কৃষ্ণকলি ও দোপাটি
ভেজে মাটি।
ঘড়িতে চারটে বাজে যেই
অমনি দোলনচাঁপা ফোটে
ঠোঁটে নিয়ে জল
কোথাও শুষ্কতা নেই, অবিকল
বর্ষার নিসর্গচিত্র। শুধু একলা কাক
পাঁচিলে পালক ঝাড়ে বার বার।
ওকি শুধু শুষ্কতা বাঁচায়, নাকি
ব্যক্তিত্বও? অথবা নিসর্গ জুড়ে ও-ই
থেকে গেল একমাত্র ফাঁকি?

এভাবে অন্ধতা

বাইরে বৃক্ষপতনের শব্দ
ভেতরে স্তব্ধতা
বাইরে মেঘের ডমরু
ভেতরে বিদ্যুৎ

আকাশে তরল সূর্য
গহ্বরে ছায়া
স্বর্গে সুন্দরী-সংরাগ
মর্ত্যে বিহ্বলতা

এভাবে চরাচরব্যাপী খেলে বেড়ায় সংযোগ
ভেসে যায় নেমে আসে নাচে প্রবিষ্ট হয়
ধ্বংস করে ফুটে ওঠে

আমি চোখ বুজে বলি এরা দুর্ঘটনা দুর্দিন মারী ব্যভিচার

এভাবেই আমি অন্ধতার দিকে স'রে যাই।

রাজপথে আসুক সে

মাথার ওপরে ছায়া নেই
অথবা পায়ের নিচে মাটি।
তবু আমি তা বিশ্বাস করি না।

প্রতিদিন আমার মৃত্যু
কীটলেহনে, অগ্নিস্পর্শে, সর্পাঘাতে, বিদ্যুৎআশ্লেষে
কখনও নিঃশব্দে আসে আততায়ী
জানতে পাই না কে ঢুকে যায় রক্তে
অসাড় হয় শিরা স্নায়ু আর মগজ।

তবু আমি এ মৃত্যু বিশ্বাস করি না।
আমাকে কিছুকাল পূর্ণারোগ্য দাও
কৃত্য সাঙ্গ করি
চেয়ে নিই ক্ষমা, শুদ্ধশরীরে।

তারপর রাজপথে আসুক সে
আমি হাত তুলে বলব, দুঃখমোচন।

মিগ্রেইন

সান্নিধ্যে রেখেছি তাকে, রেখেছি মাথায়
জন্মাবধি বেড়েছে নির্ভয়
কঠিন খোলসে অঙ্গ ঢাকে দীর্ঘকাল
দীর্ঘকাল আমি অসংশয়।

আসলে সে চিরকাল আমার ঘাতক
মগজে বেড়েছে অলক্ষিতে
অবিবেকী অর্কিডের মতো, তারপর
নিদ্রায় ঢেলেছে তার অন্তঃস্থায়ী বিষ
রক্তে কিছু খণ্ডিত পাথর।

অদৃশ্য সহজ শত্রু ফুটেছে সত্তায়
মুষ্টিতে রেখেছে বাঁধা
গ্রীবা কণ্ঠ সশিরললাট
অথচ অচেনা থেকে আজন্মজীবন
আমারই মাটিতে করে বাস্তু, রাজ্যপাট।

কবিতা কীভাবে হয়

কবিতা কীভাবে হয়, নিছক কবিতা
চেহারায়, ছন্দে, অবস্থানে?
শব্দে পিরামিড করো
অথবা মন্দির, তার মানে
একটি একটি শব্দ প্রতিটি লাইনে বেশী দাও
ঋজুদেহ অথবা কৌণিক
শব্দ ভেঙে অক্ষর বসাও পর পর
পংক্তি বাড়ে—দীর্ঘকাব্যে চাই পরিসর।
যদি বদলাতে চাও দিক
দৈর্ঘ্য ছেঁটে প্রস্থের প্রসারে রাখো হাত
চতুষ্কোণ ঘরের আঙ্গিক আনো
নিম্নরেখ শব্দে টানো গাঢ়তর কালি।
হয় না কবিতা—শুধু কথা চালাচালি?

তাহলে বিচারে রাখো বক্তব্য বিষয়।
কী বিষয় কবিতার প্রিয়?
কিছুই অচ্ছুৎ নয় জেনেছ যদিও
তবু, তবু—স্বীকারোক্তি, জীবনযন্ত্রণা?
গীতধর্মী রসাপ্লুত লিরিকের টান
কিংবা কিছু সমুচ্চ শ্লোগান
আত্মরতি, অনন্বয় অথবা যৌনতা
অথবা কবিতা কিছু বস্তু-অভিজ্ঞতা?

কবিতা কাহাকে বলে—কী তাহার মাপ
আগামী সাক্ষাতে চাই তোমার জবাব।

নিজেকে অর্পণ করে রাখা ভালো

কেবলই নিজের হাতে কর্তৃত্ব নিয়ো না নারী,
আত্মবিশ্বাসিনী।
রাখো, কিছু রাখো ছেড়ে
বাহিরে বিভ্রমে রোদে, বৃষ্টিতে সংশয়ে
কিছু শস্য হোক নষ্ট হোক
অলক্ষ্যে অথবা অপচয়ে।

নিজেকেও ক্বচিৎ কখনও
আক্রমণে, ভয়ে রেখো খুলে।
অবিন্যস্ত চুলে
নিঃশব্দ ঝরুক দুটি পাতার পালক
পরিমিতি থেকে প্রিয়তমা
নিয়ো কিছুদিন নিয়ো ছুটি।

মাঝে মাঝে, মনে
নিজেকে অর্পণ করে রাখা ভালো।
না-হয় জড়ালো পায়ে ফেলে-দেওয়া কিছু খড়নাড়া–
দিলেই বা নিজেকে কখনও মেলে, কিছু ফেলে
হাওয়ারা হঠাৎ এসে ছুঁয়ে যাক নিবন্ধ শরীর
কোনো দিন ভাঙুক পাহারা।

আরও কিছুদিন দাও

এ কেমন আত্মপ্রেম? ভালো না ভালো না
এখনও সময় আছে ভুলে যা নিজেকে
চতুর্দিকে যজ্ঞশালা, সশব্দ দৃশ্যের ঢেউ
এ বিরাট কর্মকাণ্ডে যুক্ত করো নিজেকে নিঃশেষ
বাইরে এসো, দেখো,
শেখো কীভাবে অন্যকে দেখা যায়।

শুনে যাই অহরহ কর্তব্যবিহীন।
বেরোবো, নিশ্চয় যাবো তোমাদের কাছে
শুধু আরও কিছুদিন দাও, বসে থাকি পা ছড়িয়ে
প্রপিতামহীর ম্লান গন্ধমাখা
ঝুল বারান্দায়।

চতুর্মুদ্রা

তাকালে যেই পশ্চিম-উত্তরে
লাফিয়ে উঠল ঝড়
সাপের মাথায় কাঁপল বসুন্ধর।

শিস্ পাঠালে বিদগ্ধ দক্ষিণে
দিগন্তে ঘোর লাগল আগুন

পড়ল আভা তোমার পায়ে
বেষ্টন-অর্জিনে।

ঈশান কোণে বাড়িয়ে দিলে হাত
শুষল বিপুল পার্থিব আর্দ্রতা
হিমল হাওয়া ভুজঙ্গপ্রয়াত।

পূর্বভাগে জমল চোখের জল
আকাশ পাতাল লিপ্ত হলো
বৃষ্টি এবং অশ্রুপাতে
ভাসল আমার যা ছিল সম্বল।

অবরোধ

যদি বেশি করে চাই
খসে যায় আঙুলের ফাঁকে
কিংবা করপল্লবের ঘাম
নষ্ট করে প্রার্থনার ফুল।

হই যদি মোমের পুতুল
ধবল নিষ্কাম
তাহলেও চতুর রসনা
ব্যঙ্গ করে, "রহিলে তো অনবাপ্তফল
লসিত ফসল থেকে দূর—
তবে?"

আমি পরাভবে
থাকি নিরুত্তর
দেখি তবু জেগে ওঠে শরীরের শর।

স্বদেশ শরীর

পথে যারা খুঁটে খায় খুদ
মাটির ওপরে হাসে কাঁদে
মাটিতেই খেলে, রুগ্ন হয়
মাটি ছুঁয়ে মরে
তারা কি আমার দেশ,
স্বদেশের পুষ্পিত ধারণা?

না কি তারা আমার শরীর
এই চামড়া ঘাম রক্ত
আমার আঙুল চুল নখ?
আমি কিছু উত্তর দেখি না
কোনও মুখে।

শুধু নিজেদের ঘিরে ওরা বাড়ে
ওঠে নামে নষ্ট হয়
অবশেষে বিশাল শরীর স্তূপ থেকে
জেগে ওঠে বিধ্বংসী আবেগ
নামে ঢল—
শাস্ত্রে তার নাম দ্রোহ, কিংবা প্রতিশোধ?

আমার শরীর পোড়ে নির্বোধের তাপে
অর্থহীন বিদ্যা ও বিবেক।

ফাল্গুনে নির্বন্ধ ছিল

পলাশ উচ্ছন্নে গেছে, কয়েকটা শিমুল
ছিল ধারেকাছে তবু হয়েছে ভণ্ডুল
নিশ্চিত ফাল্গুন মাস। কলকাতা শহর
দেখেছ, কী দ্রুততালে ঝরালো এ ফুল!

ফাল্গুনে নির্বন্ধ ছিল আমার অসুখ
আমাকে গোগ্রাসে খেল যেন সর্বভুক্
অথচ প্রান্তরে গন্ধ, খবর নির্ভুল
বন্ধ ঘরে উঁকি মারে কার তাম্রমুখ?

ফাল্গুনে নির্বন্ধ ছিল আমার অসুখ।

যে জায়গাটা হল ফাঁকা

যে জায়গাটা হল ফাঁকা, হল ফাঁকাই।
যতই কেন আষ্টেপৃষ্ঠে পরিস ঢাকাই,
সুগন্ধি জল অঙ্গে ছিটোও সন্ধে হলে—
একটুখানি কম পড়ে যায়, খুঁজতে চলেন
নুনের বাটি, ফিটবাবুরা ফিটবাবুটি
রঙ্গশালায়।

যে জায়গাটা হল ফাঁকা, ফাঁকাই হল
স্যাকরা ডেকে তাই বলে কি গড়াবি নোলক,
কক্‌খনো না—শূন্য শরীর শূন্য রাখিস
ভাসবে হাওয়া, শরীর ঘিরে নাচবে পাখি,
রাস্তা খোলা—চতুর্দিকে রাস্তা খোলা
রাস্তা জুড়ে আসবে তোমার চতুর্দোলা।

পুরুষ

জীবনটা কাটিয়ে গেলে বেশ—
ক্রোধে ও উল্লাসে, অভিমানে পরাক্রমে
স্নেহে অবজ্ঞায়।

কী সুন্দর এ পৃথিবী! হাতে ঝলসায়
স্পর্শযোগ্য টাকা আর সক্ষম শরীরে ন'টি চোখ।
আঙুল ঘোরালে যারা ছুটে আসে
উচ্ছিষ্ট হতেই ভালবাসে, ধর্ষণে কৃতকৃতার্থ হয়—
তারা জায়া রমণী কামিনী নারী
অঙ্গনা বনিতা চিররমা।

ব্যক্তিত্বের অগাধ সুষমা—খ্যাতি উচ্চমুখী হলে
কে গোনে কুৎসার তিল?
দুঃশীল পুরুষই পূজ্য পরিমণ্ডলের
হোক সে জননী, স্ত্রী, ভৃত্য কিংবা আবাল্যসুহৃদ।

এভাবে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে
ফেরালেও দর্শনীয় পিঠ
আমরা জয়ধ্বনি দেব—'গ্লোরিয়াস রিট্রীট!'

ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম

ফেটে যায় বাদামের খোলা
নির্ভুল অঙ্গুষ্ঠে ওঠে নামে
তর্জনীর বৃত্তাকার কঠিন শরীরে গেঁথে যায়
অদৃশ্য অপেক্ষমান জোড়চিহ্ন ঘিরে।
দু' আঙুলে নিম্নমুখী তীব্র চাপ, নাকি ক্রোধ?
মস্তিষ্ক মন্থন করে নেমে আসে প্রান্তিক পেশীতে
রুদ্ধশ্বাস ভূপ্রকৃতি—ফেটে পড়ে নির্বাক
বাদাম।

হাত, নাকি প্রাচীন অ্যাটিলা?
পাঁচটি স্তম্ভের মত দুর্বিনীত শিলা
ফুলের পাপড়ির ছলে ভুলেও কখনও
চন্দন করে নি নষ্ট, পরায় নি কোন
রক্তটিকা।
ভঙ্গিতে নাশের মুদ্রা—কয়েকটি আঙুল
প্রসিদ্ধ গঙ্গার তীরে ভেঙে যায় অনন্ত
বাদাম।

দড়ি ধরে' ওঠো

সকালে যতটা দড়ি ধরে' ওঠো
ততটাই নেমে যাও সন্ধ্যায়।
কে বলবে, কীভাবে নিষ্কাশন করলে
জীবন থেকে সবটুকু রস আদায় করা যায়!
প্রত্যেক দিনের চেহারা একরকম—
দেবীসূক্ত বা কিং লীয়রের পঙ্‌ক্তি চিবিয়ে যদি শুরু,
শেষ তবে সুনীলমাধবের বর্ণবিভ্রমে
কিংবা এস্‌পেরান্তোর একতায়।
চোখের সামনে ভিড় করে পরশ্রীকাতর, ভণ্ড ও
বেহায়া মুখগুলি
কানের পাশে ফাটতে থাকে ভিখিরির মর্মান্তিক চিৎকার—
কে বলবে, ভিক্ষা কার বাণিজ্য, কার অসহায়তা।
প্রত্যেক দিনের চেহারা একরকম—
প্রগতির পুতুল পোড়ানো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়
ফুটপাথে, শুঁড়িখানার পেছনের ঘরে, জনসভায়।

চিত্তশুদ্ধির দিকে

আত্মোৎসর্গ কাকে বলে, আমি জানি না।
কিন্তু যখন কানে শুনি ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল
বা উচ্চারণ করি মাদার টেরেসা—
বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজে।

ত্যাগ ভালবাসি না
তবু ত্যাগদীপ্ত জীবন আমাকে অনায়াসে মন্দিরের
সিঁড়িতে বসিয়ে দেয়
তখন আকাশের নিচে নিজেকে মনে হয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক,
বোধ হয়, বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ থলেগুলি
হাস্যকরভাবে ফাঁপা।

কোন কোন নাম, কোন সংকটমুহূর্ত,
কারও দুরারোগ্য ব্যাধি
আমাকে এখনও চিত্তশুদ্ধির দিকে ঠেলে দেয়।

পশ্চিমে ফেরায়

রোজ আসো, রোজ ফিরে যাও।
কখনও বিহ্বল কিংবা যেন অপ্রস্তুত পায়ে বাধা,
কখনও সতর্ক স্থির
দেখে লাগে ক্ষিপ্র তীরন্দাজ যার হাতে ফেরে হাজার বিদ্যুৎ
কোনদিন দূর থেকে দেখা মুখচ্ছবি
মনে হয় হাহা করে হাওয়া-ফেরা মাঠ
উত্তরের হেমন্তে সন্ধ্যায়।

এভাবে কে তুমি রোজ আমার সম্মুখে আসো যাও!
কী তোমার গোত্রনাম, কোন্ বৃত্ত তোমার সীমানা জানা নেই
শুধু বলো অভীপ্সা কী, কী অভীপ্সা তোমাকে ছোটায়,
বাধ্য করে, ক্লান্ত করে অবশেষে পশ্চিমে ফেরায়।

ফেরীঘাট

একদিন সবাই এসে ঠিক জড়ো হবে।
পশ্চিম গোলার্ধে তুমি আছ
আর তুমি সুদূর দক্ষিণ
উত্তরের শীতে ক্লান্ত কে তুমি, কে আছ প্রতীক্ষায়?
আমি প্রাচ্য, ফেরীঘাটে সব দেখা হবে।

এখন শুধুই ধু-ধু বালি
দূরে কালো জল, শূন্য জেটি
উল্টে থাকা সাপের খোলস
বাতাসের হাহাশব্দ মানুষের স্পর্শলোভে ফেরে
ঘুরে আসে, ফিরে ফিরে যায়।

তবু হবে, একদিন দেখা হয়ে যাবে
প্রকাণ্ড জনতা কিংবা একজন দু'জন ক'রে নিশ্চিত নীরবে
জড়ো হবে অমাবস্যা কিংবা কোনো গ্রস্ত পূর্ণিমায়
অলৌকিক ফেরীঘাট জেগে আছে, আছে প্রতীক্ষায়।

এক-বিপরীত

শরীর এক—শুধু মগজ দুটো আলাদা।
সমস্ত রন্ধ্রপথে ওদের
লোনাজল মিলেমিশে যায়
বাতাস বিনিময় করে ফুস্‌ফুস্‌

আশ্রয়বিচ্যুত চূর্ণ চুল
নষ্ট হয় প্রসাধন, চামড়া ও নখদ্যুতি।

শুধু মগজে প্রভুত্ব করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শয়তান।
তাদের গোলার্ধ বিপরীত, নীতি আপসহীন,
যুক্তি নির্মম।
মগজ আলাদা, স্নেহার্দ্র শরীর তবু এক।

তবু কেউ কেউ জানে

কিছু জানা, কিছুটা জানা না।
স্পষ্ট সব মনুষ্য লক্ষণ
সুষ্ঠু অঙ্গ, অমায়িক, পর্যাপ্ত ধীমান
বঞ্চনা করে না তাকে প্রকৃতির কার্য ও কারণ
বশ্যতা দিয়েছে নারী, বন্ধুতা পুরুষ,
অনুজেরা সশির সম্মান।

এতৎ সত্ত্বেও
থেকে যায় নিয়মে বারণ।
লক্ষ করে দেখো
উৎসব মঞ্চের কেন্দ্রে চোখে তার গম্ভীর বিষাদ
স্থির অমাবস্যা রাতে তার উপাস্য চান্দ্রেয় উল্লাস
অথবা নির্মল ভোর প্রতিশোধে বিবর্ণ, চৌচির।

যদিও একান্ত তার সাধ
প্রচ্ছন্ন থাকুক সব অন্তরঙ্গ প্রিয় দীর্ঘশ্বাস
পৃথিবী জানুক যে সে সকলের নিতান্তই চেনা
তবু কেউ কেউ জানে—কেউ তাকে কিচ্ছুই জানে না।

ভুল জায়গায়

চোখ বুজলেই দেখতে পাই তোমাকে
দাঁড়িয়ে-থাকা ঋজু শরীর
ব্যূঢ় বুক, ভারসহ কাঁধ
পাথরে খোদাই করা মুখের রেখা।
চোখ খুললে কোথাও কেউ নেই।

আঙুল ব্যাপৃত করি যদি
চুলে পোশাকে ও শিল্পেতর কর্মে—
ফুটে ওঠে নির্ভুল প্যাটার্ণ
পায়ের পাতা, কোমরের বাঁক, মাথার ফ্রেম।
আঙুল কলমে ছোঁয়ালে—নেই।
কিছু নেই।

ভুল জায়গায় দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছ
তুমি ধরা পড়বে। আর সেদিন
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী তোমাকে রেয়াত করবে না।

অপ্রাসঙ্গিক

মুষলধারে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ, শেষবিকেলে জন-মানবহীন মাঠ, মাঠের ধারে শ্মশান। শ্মশানে কোনো অগ্নিচিহ্ন নেই, কিছু নেই। শুধু একটা দরমার ঘর, তার কাঠের দরজা। বাতাসে পাল্লা দুটো বার বার বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, শব্দ হচ্ছে ঠকাস্ ঠকাস্। ঘরের ভেতরে শোয়ানো এক মৃতদেহ—আপাদমস্তক শাদা চাদরে ঢাকা। তবুও আমি জানি, সে মহিলা। ঈষৎ অবিন্যস্ত শরীর, দরজার প্রান্ত ঘেঁষে আবৃত পায়ের পাতা খানিকটা উঁচু হয়ে আছে।

এরকম আমি দেখলাম—দেখতে পেলাম বন্ধ চোখে। বিদ্যুৎ-চুল্লী দেখেছি আমি, গ্রাম্য শ্মশান কখনও না। অথচ আজ চেনা পরিবেশের ভেতরে থেকে দেখলাম অচেনা ফাঁকা শ্মশান—লোকালয় থেকে বহু দূরে, একটি ঘর, একা মৃতদেহ, সামনে একটা কাঠের দরজা। পাল্লা দুটো বন্ধ হচ্ছে—খুলে যাচ্ছে—বন্ধ হচ্ছে—খুলছে! প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, দুর্দিন, দরজায় অবিরাম শব্দ হচ্ছে ঠকাস্—ঠকাস্—ঠকাস্।

আমি জানতে চাইলাম মৃতদেহ কার। কেউ বলল না। বলার কেউ নেই। একবার মনে হল, মৃতদেহ আমার নিকট কোনো আত্মীয়র। আর একবার মনে হল, মৃতদেহ গল্পগুচ্ছের সেই কাদম্বিনীর—ম'রে যে প্রমাণ করেছিল সে মরে নি। আমি তার মুখ দেখতে পেলাম না, কিন্তু নিরন্তর জানতে চাইলাম—সে কে।

আমি কাল মায়ের কাছে যাব। মাকে বলব, 'তুমি কেমন আছ।' মা শুয়ে শুয়ে বলবে, 'এই তো আছি। তুই কেমন—রাত্তিরে এখন তোর ঘুম হয় তো।' আমি একটু চুপ করে থেকে বলব, 'হয়'।

রাজপথ

রাজপথ সাজিয়েছিল কদমে হিজলে
শিমুলে জারুলে ঘনছায়া,
সহ্য করে আছে পথ প্রভুত্ব তাদের
পিঠে বুকে ভার-টান-মায়া।
কখনও হঠাৎ যদি রাজপথ নিজের
ব্যক্তিত্ব আরোপ করে বলে—
"যে যার নিজের পায়ে হাঁটো, পথে হাঁটা-
মানুষ যেমন হেঁটে চলে।
ওপরে পাতার অন্তরাল, নিচে মূল
বারণ শোষণ সব ছাড়ো
আকাশের নিচে শুধু পথ, ইচ্ছে হলে
হতে পারি যেন-বা প্রান্তরও।"—
গাছ তবে তুলবে শিকড়, যাবে বনে।
অনাবৃত রাজপথ স্বাধীন
আকাশ মৃত্তিকা মুখোমুখি, শুধু মেঘ
বৃক্ষ ছাড়া হবে অর্থহীন।

বেড়াতে বেড়াতে মাঠে

নির্মল ভিক্ষার ছলে দাবি করো সর্বস্ব আমার
রোমকূপ ও রক্তনালী, স্নেহমেধা, আত্মার বিচ্ছিন্ন
অংশ, নিজস্ব সামান্য স্বাধীনতা।
স্বার্থপর জন্মান্ধ শাসক, সাবধান
ভালবাসা সাপ। হঠকারী
খেলবে খালি হাতে ওই
শরীর ভাস্কর্য রেখে অনাবৃত?

এখন গোধূলি, দেখো প্রকৃতি সংবৃত
এই শেষবার মুখোমুখি
স্থির করো—খেলবে খালি হাতে
সামনে রেখে বিষধর সাপ?
ওহে মূঢ়মতি
এত পরাক্রম, তবু কেন ভাঙতে পারো না নিয়তি?

তার চেয়ে আয় ঘুরে আসি
কাঁধে কাঁধ, বেড়াতে বেড়াতে মাঠে যেন-বা হঠাৎ
সংবদ্ধ শরীর জুড়ে হোক বজ্রপাত।

নীলবড়ি

'নারী বা প্রকৃতি বলো, কিছুই কিছু না।
তার চেয়ে এক সন্ধ্যা দু-একটি মনের মতো বন্ধু পেলে
প্রাণ খুলে আড্ডা দেওয়া গেলে
সমস্ত অসুখ সেরে যায়
মন ভাল থাকে,
বিদ্যুৎগতিতে লেখা হয়
পর পর সাতটা কবিতা—'

এপ্রিল সন্ধ্যার ঘোরে একজন বললেন
এবং কথার ভান্ড খালি হলে তিনি দিব্য প্রস্থান করলেন।
আমি চুপ করে হাঁটি
মাথায় ঘুরপাক খায় সরল কথাটি—
সমস্ত অসুখ সেরে যায়
সমস্ত অসুখ, শুধু সুখ!
মাথায় ক্রমশঃ জটা ধরে
শান্তি নষ্ট হয়—

বন্ধুর সান্নিধ্য পেলে সমস্ত অসুখ সেরে যায়......
বন্ধু তবু এখনও নিঃঝুম!
'মিথ্যে কথা, বন্ধু কেউ নেই'—
একবার চেঁচিয়ে উঠি, এবং তারপর
নীলবড়ি, ঠান্ডা জল, বাধ্যতামূলক মাপা ঘুম।

বৃদ্ধ পাম

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি।"

পুরোনো বাড়ির পাশ দিয়ে হে'টে গেলে
একবার দাঁড়াতে হয়।
বড়ো বড়ো থাম, জানলায় রঙিন কাচের ঢেউ
বিশাল বারান্দা ঘিরে বিনীত কার্ণিশ,
স্তব্ধ ছাদ।

তারপরও আছে—
পর্যাকুল সি'ড়ি, তালা, চিলেকোঠা, বিগতপ্রমাদ
নিচে বাগানের ছায়া, স্মৃতিচিহ্নবাহী বৃদ্ধ পাম।
পুরোনো বাড়ির কাছাকাছি হাঁটলেই বুক কাঁপে
ধু-ধু মনে হয়
সম্ভবত এ বাড়িতে আমিও ছিলাম।

অনিয়মিত

যাবে সবাই—থাকতে কে-বা পারে
এ শূন্যপথ নির্মম কান্তারে
ঘনান্ধকার। এল যে সব-প্রথম
ফিরবে আগে, আমিই থতমতো
প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে ভীষণ একা।
এমন সময় তাহার সঙ্গে দেখা—
‘একলা কেন, ফিরতে এত দেরি?’
বলল হেসে—‘সে তো নিভীর্কেরই
অনিয়মিত নিত্যদিনের মজা।
তা-ই না হলে চাই প্রসঙ্গ যার
দিনান্তে সে ঢোকে গভীর বনে?’
শুনেই আমি সঙ্কোচে এক কোণে
সরে দাঁড়াই, চোখ বুজে ঠিক বুঝি
আমার মাথায় তাহার হাতের পুঁজি।

প্রস্থান

মৃত্যুকেও পরোয়া করে নি,
সামনে এসে দাঁড়াতেই—হাসিমুখে বাড়িয়ে দু'হাত
চলে গেছে তখনই, তখনই।
পেছনে রয়েছে তার কী কী?
সন্ধ্যা ভোর দ্বিপ্রহর রঙিন পৃথিবী
বাঁকা ও সরল রেখা মুখাকৃতি বৃত্ত ও ত্রিভুজ
এবং পৃথিবী জুড়ে বিবর্ণ কাতর কিছু মুখ।

সে কিন্তু করে নি দেরি কিংবা কোনো দ্বিধা।
মৃত্যু মানে ভুলে যাওয়া—সম্ভবত জানা ছিল তার
তাই গতি লক্ষভেদী, আপাতনিষ্ঠুর
সামনে এসে দাঁড়াতেই—চলে গেছে তখনই, তখনই।

কথা

আবার আসবেন।
—আসব।
গিয়ে চিঠি দিও।
—দেব।
যা-হয় কিছু করিস।
—করব নিশ্চয়।
এই সব কথাবার্তা জমে ওঠে ঘরে প্রতিদিন
কেউ আসে না, লেখা হয় না চিঠি,
বন্ধুর জন্য চেষ্টা করা হয়ে ওঠে না কখনও।
শুধু কথা, পরিণামহীন ফাঁকা শব্দ
দৃষ্টি থেকে চোখ তুলে নেওয়া,
স্তূপাকার অজস্র মিথ্যার হলুদে ফুল।

কিন্তু সত্য যে অপ্রিয় হলে বলতে নেই!
তাই মিথ্যা—সর-মাখা নিকৃষ্ট খাবার
তুলে নিই মুখে?
দৃষ্টি থেকে দৃষ্টি তো বাঁচুক
হোক মিথ্যা, তবু কিছু সৌজন্য সঞ্চয়
অপ্রিয়তা এড়াবার সুখ—
না-হয় নিদ্রিত থাক বয়স্ক বিবেক।

দুঃখ ছুঁয়ে আসে

ডুব দিয়ে দুঃখ ছুঁয়ে আসে
দুঃখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসে
দুঃখ ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসে
নিঃস্বতায়।

উদ্যোগে সাঁতার কেটে যায়
কামড়ে ধরে সম্মুখে যা পায়
প্রাপ্তি বা কম কী শেষটায়—
মহোল্লাসে!

দুঃখ ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসে
প্রাপ্তিগুলি নিষ্ফল নিশ্বাসে
গজরায়। দুঃখটুকু শুধু
শিশুর মতন বুকে ভাসে।

কে ডেকেছে পথে

কে ডেকেছে পথে—
ও কি স্বপ্ন মতিভ্রম নাকি
আমারই অপূর্ণ আরাধনা?
আমি ওকে চিনি, তবু
চিনি না চিনি না
ও আমাকে ঠেলে দেবে
জঙ্গলে পাতালে জলে
তুলে ফেলবে স্তম্ভিত পাহাড়ে
উপড়ে নেবে জন্মাবধি মূল—
স্বপ্ন, ভুল কি অবমাননা
কে ডাকে অমোঘ ছন্দে
কে ডেকেছে পথে?

কেন

আসে, থাকে, যায়, চলে যায়
আর আসে না, কখনও আসে না।
বিশ্বাসে ভরে না মন
অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা দেয় না প্রমাণ
কেন যায়, কেন যায়, কেন?
আমরা কারণ চাই, যুক্তি চাই, হাতেনাতে বোঝা
বোঝাতে পারে না শাস্ত্র, কি মানুষ,
অথবা প্রকৃতি
ছেঁদো কথা ভরা ঝুলি, অনুভবহীন বোধ
ভয়ার্ত বিহ্বল।
অকালে প্রস্থানদণ্ড কেন পাবে নির্দোষ জাতক,
অনিয়ম কেন তুলবে প্রায়ই তার ভয়ংকর হাত?
আমরা বিচার চাই
আমরা কিছু গো-মূর্খ মানুষ
যে-আমরা বুঝি না কেন কেউ কেউ কখনও ফেরে না।

ছোটবড়ো

ছোট থাকতে দাও
অভিখ্যামণ্ডিত মুখছবি
চোখে বিচ্ছুরিত রোদ, মাথার পেছনে চন্দ্র-আভা
নির্বোধ দায়িত্বহীন দিন
দীর্ঘায়িত কুসুমের মাস।

বড়ো হতে হবে, খুব বড়ো?
সন্তানপালন থেকে রাজ্য প্রশাসন—কী কী চাই?
আপ্যায়ন, শাস্ত্রবোধ, জটিল সমস্যা খুলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া
ন্যূনতম সময়ের পরিবর্তে কোন দীর্ঘ কর্মকাণ্ড, তা-ও
নির্বিঘ্নে সাধিত হবে। রাত্রিকালে সেবা—
সুস্বাদু ব্যঞ্জন কিছু, মহার্ঘ পানীয়
বিন্যস্ত শয্যায় পাতা প্রস্তুত শরীর—
হাতে হলুদের ছোপ, চোখে কালি এবং মমতা।

মুছে যাবে রোদ
মাথার পেছনে আভা নয়, শাদা চুলের বর্তুল
লাবণ্যের প্রসিদ্ধ প্রস্থান।

ছোট চাই, নাকি চাই বড়ো?

শর্ত

এক শর্তে নিতে পারি কাছে।
কখনও তুলবে না প্রশ্ন
আমি কার সবচেয়ে বেশি
কাকে দিতে পারি সব
কার জন্য ছাড়ি অনায়াসে
সুখ কিংবা আনন্দের মৌক্তিক সোপান;
ভ্রূ-মধ্যে তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে বলবে না
শুনে রাখ, এ আমার না-পছন্দ
কিছুতে চলবে না এই ইচ্ছাধীন চলাফেরা, থাকা;
পিঠের কপাট দিয়ে পর্বত প্রমাণ
বন্ধ করে নেবে না দরোজা—
এই শর্তে নিতে পারি কাছে।

শর্তহীন নিতে পারি কাছে।
কাছে এস, ছুঁয়ে দাও
ঢেকে দাও রুক্ষ ত্বকে সব রোমকূপ
স্বচ্ছন্দে আরোপ কর শখ।

কাছে এলে বলা যায়, আছে।

আসলে ভোরবেলা

তোমার হাতে মানায় না এ ভীষণ শব্দ, সখী।
কোথায় সন্ধ্যা সন্ন্যাস আর গম্ভীর গেরুয়া—
কোথায় অতুল জঙ্ঘা ঊরু পদ্মনিভ স্তন
উষ্ণ নরম স্নেহের শরীর। গাঢ় সবুজ ঘাসে

বিছিয়ে রাখো তার উপমান নিশ্চিত আশ্বাসে।
ইচ্ছে হলে সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসিনী খেলা
একটু খেলো তারপরে ফের ফিরিয়ে নিয়ে মন
পুতুল তুলে আদর করো। তাছাড়া অসূয়া
ঘিরবেই তো দশটি আঙুল, যেন বা এ শখই—
তোমার সায়ং বর্ণচোরা, আসলে ভোরবেলা।

হঠাৎ একদিন

কাছে কাছে থাকা
হঠাৎ একদিন তবু মনে হয়, দীর্ঘদিন পরে দেখা হল।
"এই যে, খবর ভালো? বহুদিন পর—"
"বহুদিন, তুমি?"
চলছে যেমন চলে যায়, চলে যায় দিন মাস বছর বছর
ক'বছর—আট ষোলো বত্রিশ বিরাশি?
উত্তাপ তেমনই আছে জল স্থল অন্তরীক্ষ জুড়ে?—
বিদ্যুৎ চমকায় দ্রুত, একবার দু'বার।

এভাবেই দেখা হয় মাঝে মাঝে, তাছাড়া কিছু না
তারিখেরা হেঁটে যায় নির্বিকার—লম্বা সারি বেঁধে।

বেরালছানা

ভেতরে যাকে গোপনে লালন করি
সে আসলে অহংকার
আমার বেড়ালছানা।
তার পুষ্টি
প্রেমে বিবাদে বিষণ্ণতায়—
দেখে খুশি হই
সে আমার অস্তিত্বের পিঠে হাত বোলায়,
আমিও।
বাইরে বেরোলে শুধু মার খেয়ে ফিরে আসে
তাই ভেতরে রাখি নিরাপদ দূরত্বে
মরণ একদিন তার সুনিশ্চিত
তবু কিছুদিন থেকে যাক
প্রশ্রয়ে অন্যায়ে ভয়ে
অহংকার, আমার বেরালছানা।

কলম

উজ্জ্বল কলম, তুমি কার?
জৌলুশে পালিশে রঙে—অপেক্ষায় চাপা
কাচঘরে
কুমারী মেয়ের মতো মুখর, তুমি কার?
মেধাবী বয়স্ক হাতে প্রাথমিক স্পর্শ পাবে, নাকি
অসহিষ্ণু শিশুর আঙুল
অক্ষর লেখাবে ভাঙাচোরা
অথবা মনস্ক যুবা প্রগাঢ় বাসনা আঁকবে
কাগজের নীলিমায় প্রেমিকার নামে-
তুমি জানো? মহার্ঘ কলম
অমালিন্যে অর্থহীন, নির্বিশেষ পণ্য হয়ে আছ
কবে, কার হবে?

প্রতিমার মতো মুখ

ভাসানের আগেই ভাসান, তা কি হয়।
কিছু তো প্রতিমা নয়
তবু প্রতিমার মতো মুখ
দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর, দীর্ঘ পক্ষ্মরেখা
পানপাতা চিবুকের ডৌল
ভাসানের মতো শুয়ে পেতেছে শরীর।

কেন শুধু শুয়ে থাকে?—জিগগেস করেছে এক শিশু
কেউ তাকে সত্য জানাবে না,
কেন শুধু শুয়ে থাকে মাতৃনামে বীতবন্ধ প্রমা
শুয়ে থাকে বাক্যহীন অশ্রুবিন্দু হয়ে
আমাদের সকলের ক্ষমা।

ভাসানের নৌকো ঘাটে আসে
—যাই, তবে যাই, তবে আসি—
ঘাটের কিনারে কারা? ক'জনের মুখ?
প্রতিমা চোখের জলে ভাসে।

কয়েকটি ছোট কবিতা

১

নির্যাতনে কে দিয়েছে ভাষা?
কবিতা, কবিতা।
কে পেয়েছে এত ভালবাসা?

সেও তো কবিতা।
তাহলে স্বাধীন রেখো তাকে
সে যেন স্বেচ্ছা-ধৃত থাকে।

২

বাইরে এক শরীর ছোটাছুটি করে
ভেতরে নিস্তেজ হয় অন্যজন
পৃথিবীতে পা ফেলে এক মানুষ
ভেতরে কুণ্ঠিত হয় অন্য কেউ।

দুটি সমান্তরাল রেখা
যেন মাটি ও নিচে বহমান জলস্রোত
আমার শরীর ও আমি
অথবা আমি এবং আমি।

৩

যে আগুনে ভেতর থেকে শরীর পোড়ে
তা কি তোমার আছে?
তাহলে তুমি দুঃখী।

যে আগুনে ভেতর থেকে শরীর পোড়ে
তা কি তোমার নেই?
তাহলে তুমিই দুঃখী।

৪

দু'বার পোশাক পরার মধ্যে
একবার নগ্নতা আসে—
দু'টি দিনের মাঝখানে
একবার রাত।

মানুষ সেসময়ে নিজেকে আবিষ্কার করে
আর এভাবে বাড়তে থাকে
অভিজ্ঞতা নগ্নতা ও রাত্রি।

৫

আমার শরীরের উত্থানগুলি অভিমানের পাহাড়
পতনসমূহ মোহভঙ্গের প্রোথিত সরসী,
আমি ডাকব না
আমি ফিরিয়ে দেব না
গৃহস্থ বা পথিক—যে আসুক, যে ফিরে যাক।
আমি দাঁড়িয়ে থাকব হৃদয়হীন মানচিত্রের মতো
পাহাড় ও সরসী
নিরুপায় দূরত্ব থেকে পরস্পরকে ঈর্ষা করবে
অথবা করুণা।

৬

গেলে সব কেড়ে নিয়ে যায়
শূন্য হাতে ফেরে
অথবা ছোঁয় না কিছু, নিঃশব্দে হারায়
ফেরে না আখেরে।

ধুলো ছোঁড়ে চৈত্রের বাতাস
পৃথিবী জর্জর
সে দেখে না রূপ কিংবা শোনে না সুস্বর
হাসে অট্টহাস।

শর্তাধীন না সে
কেন তবু ফিরে ফিরে আসে!

৭

যে পারে আপনি পারে
যে পারে না কখনও পারে না
যে হারে এসেই হারে
যে হারে না কখনও হারে না।
তবু কেউ ঘুরে ঘুরে আসে

ধরা পড়ে লজ্জা ও সন্ত্রাসে
মরে, কবিতাকে ভালবাসে
তবু তার প্রণয় কাড়ে না।

৮

বকুলবৃক্ষ ঝাঁকিয়ে দিলে
মাটিতে ফুল পড়ে
আমিও কিছু কুড়িয়েছিলাম
প্রকাণ্ড এক ঝড়ে।

আমার কিছু ঝ'রে পড়ুক
আপনি আসুন, কাঁপান
একটি শিশু কুড়িয়ে নেবে
আপনি যদি না পান।

৯

কিছুই কিছু না,—এই কথাটা বলেও
মুখে তার কিছু বাকি থাকে
যখন যাবার আগে আপাদমস্তক
একবার শুধু চোখ রাখে।

তারপর যে যাহার কাজে
একটি সেতারে ধুন বাজে।

১০

আগুনে পুড়েছে দেহ, অথচ শীতল
পাথরে সাজানো বুক, স্থির অচঞ্চল
স্পর্শেও জাগে না ঢেউ এ হিম সাগরে।
এ-হেন বিষণ্ণ ম্লান অন্ধকার ঘরে
তবু কোন্ পরমার্থ লোভে এলি তুই
সাতটি পাপড়ি খুলে চিন্তাহীন, জুঁই!

আগুনে পুড়েছে অঙ্গ, হৃদয়ে শিশির
চলে যা চলে যা জুঁই, হব না অস্থির।

তোমার ভ্রূক্ষেপহীন

খিড়কি দিয়ে এলে স্বপ্ন, খিড়কি দিয়ে ফিরে চলে গেলে
ছুঁয়ে দেখলে একটি দুটি রান্নার বাসনপত্র, আর
অন্দরের প্রাত্যহিকতার চূর্ণগুলি
(কত খুঁত সেসব জায়গায়, এত অপ্রস্তুত আমি),
তারপর পেছন উঠোন দিয়ে চলে গেলে মাটির রাস্তায়।

সাজানো মহল সামনে—বইপত্র, পিকাসোর প্রিন্ট
আবদুল করিম কিংবা জন গিলগুড
পড়ে রইলো শূন্য ঘরে, তোমার ভ্রূক্ষেপহীন, বৃথা।
স্বপ্ন, তুমি দেখে গেলে ভুলে ভরা জৈবিক নির্মাণ
উপেক্ষা ছড়িয়ে গেলে সে আত্মপ্রসাদে
যে আমার ঐকান্তিক স্বপ্রেম রচনা।